মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণ

আলেখ্যানুষ্ঠান ‘তাঁদের সংগ্রামের বীরগাথা’

বাংলাদেশের ইতিহাসে জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমাম দুটি অনন্য নাম। তাঁদের জীবন ও সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়, বরং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও মুক্তির আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দুই মহীয়সী নারীকে স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই বিকেল পাঁচটায় জাদুঘরের মিলনায়তনে আয়োজন করে স্মরণালেখ্য ‘তাঁদের সংগ্রামের বীরগাথা’। অনুষ্ঠানে স্মারক ভিডিও, সংগীত, নৃত্য, কবিতা ও জীবনকথন পাঠের মাধ্যমে তাঁদের জীবন, আদর্শ ও অবদান নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দুই মহিয়সী নারী সম্পর্কিত স্মারক ভিডিও প্রদর্শিত হয়। তারপর সুফিয়া কামাল ও ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী

তাজউদ্দীন আহমদ-এর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

যখন বিজয়ের পরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রতিক্রিয়া কী? তখন একজন দক্ষ, সৎ, নিষ্ঠাবান, বিজ্ঞ রাজনীতিবীদ বলেছিলেন আমি তো ধাত্রীর ভূমিকা পালন করেছি মাত্র, মা এখনো কারাগারে। এই রাজনীতিবীদ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, মুক্তিযুদ্ধের জন-আকাঙ্খা অনুসারে রাষ্ট্র গড়তে চায়, তারা অবশ্যই কৃতজ্ঞচিত্তে এই ৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘৭১-এর শরণার্থী: ইতিহাসের বৃহত্তম মানবিক ট্র্যাজেডি’

স্মৃতিচারণে সোচ্চার হাজারো মানুষ

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থী সংকটকে কেন্দ্র করে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক রিল ‘৭১-এর শরণার্থী: ইতিহাসের বৃহত্তম মানবিক ট্র্যাজেডি’ প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলে। একাত্তরের গণহত্যা, গণ-বাস্তুচ্যুতি, শরণার্থী জীবন এবং মানবিক বিপর্যয়ের ইতিহাস তুলে ধরা এই ভিডিওটি ইতোমধ্যে প্রায় ১০ লক্ষাধিক দর্শক দেখেছেন। ভিডিওটিতে হাজার হাজার মানুষ মন্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের পারিবারিক স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার তুলে ধরেছেন।

রিলটিতে তুলে ধরা হয়, ১৯৭১ সালের গণহত্যার মুখে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হতে ৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আমার বাবা শহীদ হন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন ‘একাত্তরের স্মৃতিচারণ’ অনুষ্ঠানে ৯ জুলাই ২০২৬ স্মৃতিচারণ করেন শহীদ-সন্তান আব্দুল হামিদ। তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হন। আমরা তখন ছোট। বড়বোন আয়েশা খাতুনের বয়স তখন আট। বাবার অভাব আমরা তিন ভাই-বোন খুব অনুভব করেছি। আমাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণে মাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু সব কিছুর পরও সান্ত্বনা একটাই, আমার বাবা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন– এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এই বধ্যভূমিতে আমার বাবার লাশ রাখা হয়েছিল। আমি এখানে আসি আমার বাবার মতো সহস্র শহীদের টানে। জল্লাদখানা মানে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের জীবন্ত স্মারক। এখানে এলে বেশি কিছু বলা লাগে না। যে কূপের উপর রেখে মানুষকে জবাই করা হতো, সেখানের কিছু স্মারক এবং এর নির্মাণ আমাদের সব কিছু বলে দেয়। আমরা বুঝতে পারি কতটা নির্মমভাবে আমাদের হত্যা করা হয়েছে একাত্তরে। আমরা এটা ভুলতে পারি না! আমরা এটা কখনো ভুলবো না!

আব্দুল হামিদ জানান, একাত্তরের ২৬ মার্চ সকাল থেকেই মিরপুর এলাকায় আতঙ্কময় পরিবেশ বিরাজ করছিল। পাকসেনা ও তাদের সহযোগী বিহারিরা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ, লুট, ধরপাকড় ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত এলাকাবাসী পরিবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছিল। সেভাবে আব্দুল হাকিম স্ত্রী, ছেলে-মেয়েসহ সাভারের কুন্ডা গ্রামে তার বোনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পনেরো দিনের মাথায় আব্দুল হাকিম মিরপুরে এসে আর ফিরে যেতে পারলেন না পরিবারের কাছে। মিরপুরের সেনপাড়া বাস ডিপোর পেছনে পাকসেনা ও বিহারিরা মিলে অনেকের সাথে আব্দুল হাকিমকেও কুপিয়ে হত্যা করে। স্থানীয় অনেকের ধারণা বিহারিরা তার লাশ জল্লাদখানায় নিয়ে ফেলেছিল। এভাবে জল্লাদখানায় ধরে এনে জবাই করে হত্যা করা হয় হাজার হাজার বাঙালিকে।

৯ জুলাই ২০২৬ সকালে জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে সাপ্তাহিক আয়োজনে কথা বলেন আব্দুল হামিদ। এদিন মিরপুর সেকশন ১০ এলাকার শহীদ আবু তালেব উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ২৩ জন শিক্ষার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করে এবং স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে একাত্তরের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নতুন স্মারক

বীর মুক্তিযোদ্ধা কানাই ঘোষের একাত্তরের দিনলিপি

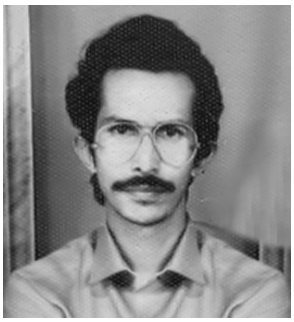

বীর মুক্তিযোদ্ধা কানাই ঘোষে

১৯৭১ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কিশোর বীর মুক্তিযোদ্ধা কানাই ঘোষের একাত্তরের ঐতিহাসিক দিনলিপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে নতুন স্মারক হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ৪ জুলাই ২০২৬ সাংবাদিক ও গবেষক রীতা ভৌমিক ডায়েরিটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করেন। এই দিনলিপি কেবল একজন মুক্তিযোদ্ধার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ নয়; এটি মুক্তিযুদ্ধের একটি মূল্যবান প্রামাণ্য দলিল। ডায়েরিতে কানাই ঘোষ তাঁর কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত, ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের দুরূহ যাত্রা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দেশীয় রাজাকারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন গেরিলা অভিযানের ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ডায়েরির বর্ণনা অনুযায়ী, ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার লস্করদিয়া গ্রামের সন্তান কানাই ঘোষ পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সংকল্প গ্রহণ করেন। পরিবারের আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি ভারতে যান এবং বিহারের একটি দুর্গম প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সামরিক ও গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ভারতীয় ও রুশ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তিনি বিভিন্ন ধরনের রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি, রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড, মাইন ও ডিনামাইট ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বয়রা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে লস্করদিয়ায় রাজাকার বাসুদেব রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান, নগরকান্দা-তালমা সড়কে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা, কেশবনগর ও বাবুজ ব্রিজ ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে শত্রুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং প্রায় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে নগরকান্দা থানা আক্রমণ। ডায়েরিতে যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, কঠিন জীবনসংগ্রাম, ভয়, সাহস, দেশপ্রেম এবং বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাও অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উঠে এসেছে। সর্বশেষ ১৭ ডিসেম্বর ফরিদপুরের চুনাঘাটায় পাকিস্তানি ও বিহারি সৈন্যদের বিরুদ্ধে পরিচালিত চূড়ান্ত অভিযানের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের মুক্তির বর্ণনাও দিনলিপিতে লিখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বীর মুক্তিযোদ্ধা কানাই ঘোষ-এর দিনলিপি হস্তান্তর করেন সাংবাদিক রীতা ভৌমিক

ডায়েরিটির সংগ্রহের ইতিহাস সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কানাই ঘোষের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী জীবন ছিল নানা সংগ্রাম ও প্রতিকূলতায় পূর্ণ। ১৯৮৪ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কর্মরত অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন তথ্য উপসচিব রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর কাছে আসেন কানাই ঘোষ। শীর্ণকায়, অপুষ্টিজনিত চর্মরোগে আক্রান্ত, আর্থিক অনটনে জর্জরিত এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা জীবিকার সন্ধানে ঘর ছেড়ে রাজধানীতে এসেছিলেন। সাক্ষাতের সময় তিনি নিজের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা একাত্তরের ডায়েরিটি রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর হাতে তুলে দেন। পরবর্তীকালে তিনি কানাই ঘোষকে বাংলাদেশ রেলওয়ের একটি চাকরির জন্য তাঁর শিক্ষক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক এক সচিবের কাছে সুপারিশ করেন এবং

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

তাজউদ্দীন আহমদ-এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানুষটিকে স্মরণ করবে। ২৩ জুলাই ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ-এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচনায় বক্তারা এই অভিমত প্রকাশ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তৈরি সংক্ষিপ্ত ভিডিও, দেশাত্মবোধক গান, তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি থেকে পাঠ, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি এবং প্যানেল আলোচনায় সাজানো হয়েছিল স্মরণ অনুষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার যে তরুণদের মোহমুক্তি ঘটেছিলো তাদের অন্যতম তাজউদ্দীন আহমদ। জীবনের প্রথম পর্বে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদে এদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, তবে তাজউদ্দীন আহমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন। যে সময়ে তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যে সরকারের পক্ষ থেকে তিনি এদেশের সমগ্র শক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে জাগ্রত করেছেন এবং যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে তার রূপরেখাটি কী হবে সেই ঘোষণাও দিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে রাষ্ট্রটি হবে সাম্যের রাষ্ট্র, সমতার রাষ্ট্র, সামাজিক ন্যায় বিচারের রাষ্ট্র। তাজউদ্দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধকালীন অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরো সময়ে এই মানুষটি নির্লোভ, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন। প্যানেল আলোচনায় আলোচক হিসেবে ছিলেন লেখক, সাংবাদিক ইমতিয়ার শামীম, ইতিহাসবিদ গবেষক ড. সুলতানা আক্তার এবং কথাসাহিত্যিক সুহান রিজওয়ান। তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে লেখক ইমতিয়ার শামীমের গ্রন্থের নাম 'তাজউদ্দীন : নিঃসঙ্গ এক মুক্তির নায়ক'। গ্রন্থের শিরোনামের সূত্র ধরে তিনি বলেন, তাজউদ্দীন আহমদ সারাজীবন যে সংগ্রাম করেছেন সেই সংগ্রামের হিসেব নিকেশ যদি আমরা করতে যাই, তাহলে শেষপর্যন্ত দেখতে পাব প্রস্তুতির পর্বে আর গন্তব্যে যাওয়ার অর্থে তিনি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, নেতৃত্বের জায়গা থেকে দেখতে গেলে ৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের সময় আক্ষরিক অর্থেই তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন, কারণ তার আগ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের যে পর্বগুলো সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতা হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন কিন্তু ৭১ সালের ২৫ মার্চের পর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। নেতার অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদকে সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পথে পুরো ৯ মাস প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইমতিয়ার শামীম মনে করেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে ৯ মাসে তাজউদ্দীন আহমদ যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন পরবর্তীতে জাতি সেটাকে উপলব্ধিতে নিতে পারেনি। তাজউদ্দীন চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন তাজউদ্দীন আহমদ যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে রাষ্ট্রে বর্তমানে আমরা বসবাস করছি আমরা তাকে বহন করছি। যেখানে আমাদের মূল উৎস, সেই উৎসকে যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে আমরা পথ হারাবো। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং তাজউদ্দীন আহমদ বিষয়ক গবেষক ড. সুলতানা আক্তার বলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কীভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় তা তাজউদ্দীন আহমদের জীবন আমাদের শেখায়। তাজউদ্দীন আহমদ একই সাথে বুদ্ধি এবং বিবেক দিয়ে রাষ্ট্র এবং সমাজকে দেখেছিলেন, এই দুটি গুণের সমন্বয়ও আমাদের সমাজে কম দেখা যায় বলে তিনি মনে করেন। তার মতে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাজউদ্দীনই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবীদার। কেননা, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তার পরের অবস্থান সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, দ্বিতীয়ত অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে যে হাইকমান্ড গঠিত হয়েছিলো সেখানেও বঙ্গবন্ধুর পরেই ছিল তাজউদ্দীন আহমদের অবস্থান, তৃতীয়ত ড. সুলতানা আক্তার আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে বলেন যে ১৯৭১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ছাত্রনেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে, আর কোন কারণে আমি যদি না থাকি, তাজউদ্দীন হবে নেতা। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুই তাজউদ্দীন আহমদকে তার অবর্তমানে নেতা নির্ধারণ করেছিলেন। কাজেই ১৯৭১ সালে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণ নিঃসন্দেহে যৌক্তিক। তিনি বর্তমান প্রজন্মকে তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে গবেষণায় যুক্ত হতে বলেন। কথাসাহিত্যিক সুহান রিজওয়ান রচনা করেছেন তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে উপন্যাস 'সাক্ষী ছিলো শিরস্ত্রাণ'। তিনি বলেন আমরা যদি বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে অপরিহার্যভাবে কথা বলতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে তিনি কিছু সমস্যার উল্লেখ করেন। তার মতে ইন্টারনেটের আবির্ভাবের পরে হাজার হাজার ফটো কার্ড, লাখ লাখ রিলস আর কোটি কোটি পডকাস্ট একটা বিকল্প ইতিহাস তৈরি করেছে। যে ইতিহাস জেনে একটা প্রজন্ম বড়ো হয় হঠাৎ তাদের সামনে আসে বিকল্প ইতিহাস। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে তরুণ প্রজন্মের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাদের কাছে ইতিহাস ঠিক পরিস্কার করা যায়নি। সুহান রিজওয়ান মনে করেন ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের তরুণদের অস্পষ্টা, দূরত্ব এটা দূর করার জন্য তাজউদ্দীন আহমদ প্রাসঙ্গিক। এই ব্যক্তিত্ববান এবং অন্তর্মুখী মানুষ কখনোই নিজের কৃতিত্বের কথা কাউকে বলে যাননি। ফলে বাংলাদেশে যারা ইতিহাসের অনুসন্ধান করেন তারা তাজউদ্দীন আহদের সেই অভিমানে না বলা কথার ভার বহন করে চলেছেন। ইতিহাসে ২৬৬ দিনে তাঁর যে না বলা কথা আছে, কৃতিত্ব না নেয়ার যে মহানুভবতা আছে, সেখানেই ফাঁক তৈরি হয়েছে আর বিকল্প ইতিহাস সেখানে স্থান করে নিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। সুহান রিজওয়ান সেই না জানা তাজউদ্দীনের খোঁজই করেছেন তার উপন্যাসে।

আয়োজনে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সেঁজুতি বড়ুয়া, তাজউদ্দীন আহমদ-এর ডায়েরি থেকে পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী মহিউদ্দীন শামীম এবং মুক্তিযুদ্ধের কবিতা পাঠ করেন কণ্ঠযোদ্ধা আবৃত্তি শিল্পী আশরাফুল আলম।

স্মৃতিচারণে সোচ্চার হাজারো মানুষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাধ্য হয়–যা সে সময় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মানবিক সংকট। সীমান্ত পাড়ি দেওয়া মানুষের দুর্ভোগ, চুকনগর গণহত্যা, শরণার্থী শিবিরে কলেরার ভয়াবহতা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবিক সহায়তা এবং বিশ্ববিবেককে নাড়িয়ে দেওয়া নানা ঘটনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ভিডিওটির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হয়ে ওঠে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া। অনেকেই জানান, তাঁরা নিজেরাই ১৯৭১ সালে শরণার্থী ছিলেন। কেউ আগরতলা, কেউ ত্রিপুরা, কেউ পশ্চিমবঙ্গ কিংবা আসামের শরণার্থী শিবিরে কাটানো নয় মাসের স্মৃতি ভাগ করে নেন। অনেকে লিখেছেন, কলেরা মহামারিতে পরিবারের সদস্যদের হারানোর বেদনাময় অভিজ্ঞতার কথা, আবার কেউ স্মরণ করেছেন শরণার্থী শিবিরের অনাহার, রোগব্যাধি, অনিশ্চয়তা এবং প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার দিনগুলোর কথা।

অসংখ্য মন্তব্যে উঠে এসেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের স্মৃতিও। যাঁরা একাত্তর দেখেননি, তারা তাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানির মুখে শোনা শরণার্থী জীবনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। কোথাও এসেছে নদীপথে পালানোর স্মৃতি, কোথাও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পর উদ্বাস্তু হওয়ার গল্প, কোথাও বা সন্তান হারানোর শোক। এসব মন্তব্যে ব্যক্তিগত ইতিহাস এক হয়ে গেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে।

ভারত থেকেও বেশ কয়েকজন মন্তব্যকারী তাদের অভিজ্ঞতা ও পারিবারিক স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন। কেউ জানিয়েছেন, কীভাবে তাদের পরিবার বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল; কেউ স্মরণ করেছেন উদ্বাস্তু মানুষদের সহায়তায় স্থানীয় মানুষের মানবিক ভূমিকার কথা। অনেকেই ভারতের সাধারণ মানুষ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাঁরা ১৯৭১ সালে শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভিডিওটির মন্তব্যগুলো শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতিক্রিয়া নয় বরং মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। একাত্তরের শরণার্থী জীবনের ব্যক্তিগত স্মৃতি, পারিবারিক বয়ান নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংরক্ষিত এসব অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল দলিল-দস্তাবেজে নয়, মানুষের স্মৃতি, অনুভূতি এবং পরম্পরার মধ্যেও জীবন্ত হয়ে আছে।

ভিডিওটি দেখতে লিংক ক্লিক/ কিইউআর স্ক্যান করুন

https://www.facebook.com/share/v/1CmKD1YrGe/

বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের প্রতিনিধি দলের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের উপমহাপরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, এসজিপি, বিজিবিএম, পদাতিক-এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২১ জুলাই ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলকে স্বাগত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন এবং ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। এ সময় মফিদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, দলিল ও নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জাদুঘরের বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরেন। পাশাপাশি দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতা বিনিময়ের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়।

প্রতিনিধি দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা বাঙালির হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ গভীর আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় প্রদর্শিত বিভিন্ন দলিল, দুর্লভ আলোকচিত্র, শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত স্মারক, শিল্পকর্ম এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সম্পর্কে তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ করেন। জাদুঘরের প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, গণহত্যা, গণপ্রতিরোধ, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা প্রতিনিধি দলের সদস্যদের গভীরভাবে মুগ্ধ করে।

পরবর্তীতে প্রতিনিধি দল জাদুঘরের গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ পরিদর্শন করেন। এ সময় জাদুঘরের ড. রেজিনা বেগম এবং আমেনা খাতুন আর্কাইভ ও গ্রন্থাগারের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। তারা আর্কাইভের বহুমাত্রিক কার্যক্রম, গবেষকদের গবেষণা সহায়তা, ব্যবহারকারীদের সেবা, মুক্তিযুদ্ধের বই, পত্রিকা, দলিল, প্রকাশনা এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিনিধি দলকে সাম্যক ধারণা প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ ও গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ সংগ্রহ, গবেষণাবান্ধব পরিবেশ, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং পেশাদার সংরক্ষণ কার্যক্রম গভীর আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণে জাদুঘরের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক উপকরণ সংরক্ষণের উদ্যোগ তাদের গভীরভাবে অভিভূত করে।

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা, শিক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। তারা জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব এবং আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মন্টু বাবু সরকার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দলের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) প্রতিবছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পরিচালিত "ব্লাস্ট-ব্র্যাক জেপিজি সামার ইন্টার্নশিপ" কর্মসূচির আওতায় ইন্টার্নশিপের আয়োজন করে থাকে। কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২ জুলাই ২০২৬ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। এই পরিদর্শন কেবল প্রাথমিক পরিচিতিমূলক কার্যক্রম নয়; এর মাধ্যমে ইন্টার্নরা বাংলাদেশের ভিত্তিমূলক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং দেশের ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার-ভাবনা গঠনে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ, প্রতিরোধ ও চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ভাববার সুযোগ পান। আট জনের এই দলের মধ্যে চীন, পাকিস্তান ও তাইওয়ানের সদস্যও ছিল। পরিদর্শনের সূচনা হয় একটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে, যা অংশগ্রহণকারীদের একাত্তরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কালানুক্রমিক ধারণা দেয়। এরপর ইন্টার্নরা জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে জাদুঘরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তরুণ প্রজন্মকে জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিদর্শন নিয়ে দুইজন বিদেশি ইন্টার্ন নিজেদের উপলব্ধির কথা তুলে ধরেন।

ক্রিস্টোফার রাফায়েল ফেন, ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড : বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে বর্ণনা করতে এর আগে কখনো শুনিনি; সেই গণহত্যার প্রমাণের মুখোমুখি হওয়া তো আরও

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রী সংসদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

‘বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রী সংসদ’-এর সদস্য মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ৪ জুলাই ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এসময় তাদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রী সংসদের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. আবুল হায়াত হেদায়েতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক বীরপ্রতিক, মাহবুব জামান, শেখ রবিউল হক, জয়ন্তী রায়, কাওসার চৌধুরী, রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, পদ্মা রহমান, বোরহান উদ্দিন মিঠু, তৌফিকুল বারী, শামছুল হক সিকদার, ছাদেকুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম কাঞ্চন, ইউজিন ভিনসেন্ট গোমেজ, এ কে এম শামীম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, রওশন আরা বেগম, ফরিদা আখতার, আবু আক্কাস, মো. জাহাঙ্গীর খান, আব্দুল মালেক, গোলাম হায়দার, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, আমির হোসেন মোল্লা. বিমল চন্দ্র দাস, মফিফুল ইসলাম খান, আনোয়ার হোসেন পাঠান, মো. আনোয়ারুল হক, মো. মনসুর আলী, গিলবার্ট নির্মল বায়েন, চাঁন মোল্লা, দিল আফরোজ

বেগম দিলু, আব্দুর রাজ্জাক, মো. তৌহিদুল বারী খান, এস এম শফিকুল ইসলাম, আবু মো. সায়েম প্রমুখ। বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ যুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে রাজনৈতিক অভিলাষ ও প্ররোচনায় বিকৃত করার প্রয়াস যেন না হয়, সেদিকে সরকার দৃষ্টি দেবেন বলে মনে করেন বক্তাগণ।

সভায় মতবিনিময় শেষে শিখা অম্লানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, প্রয়াত বীর শহীদ, বীরমুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ১মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। তারপর সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন উত্তর সভায় সকলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পাকিস্তানি লেখকের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

২৭ জুন ২০২৬ পাকিস্তানের প্রখ্যাত লেখক, সম্পাদক এবং অনুবাদক আজমল কামাল সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির সমালোচনা করেন, পরবর্তীতে তার সম্পাদিত পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন। জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করে লেখেন–

It was an overwhelming experience to visit the four galleries of the LWM, very kindly guided by Mr. Naasehun Ameen, Ms. Lisa and Ms. Maliha. Before that Mr. Mofidul Hoque, fascinatingly narrated the story of how this museum was conceived and built with the active participation of several generations of the Bangladeshi community and how it became an on-going people’s initiative to present and promote the nation’s history from ancient times to the establishment of Bangladesh as an independent country. I was also impressed by the description of the various projects undertaken under the museum. I am really appreciative of this wonderful institution. I thank my friend Fauzia Khan for introducing me.

Ajmal Kamal
Literary editor, translator and publisher from Karachi
Pakistan

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

৪-এর পৃষ্ঠার পর

পরের কথা। এই জাদুঘরের ভেতর দিয়ে ঘুরে আসার পর মানুষের নিষ্ঠুরতা নিয়ে গভীরভাবে না ভেবে থাকা সম্ভব নয়। গ্যালারিগুলো দর্শকদের সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। এই নৃশংসতায় আমার নিজের দেশের ভূমিকা নিয়েও ভেবেছি। ব্রিটিশ দেশভাগের নিষ্ঠুর উদাসীনতা না থাকলে হয়তো এই সংঘাতই ঘটত না। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল মফিদুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ; জাদুঘর প্রতিষ্ঠার নেপথ্যের গল্প, বাংলাদেশের তরুণদের নিজেদের ইতিহাস এবং তাদের দাদা-দাদি ও নানা-নানিদের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস আর উত্তরাধিকার নিয়ে তার আবেগ–সবই ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক।

জেফির চাই ফোর্বস ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অত্যন্ত যত্ন ও নিপুণতার সঙ্গে সাজানো একটি স্থান। চারটি গ্যালারি ঘুরে দেখা শুরুর আগে আমরা নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা একটি তথ্যবহুল প্রামাণ্যচিত্র দেখেছি। ইন্টার্ন হিসেবে জনাব মফিদুল হকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া ছিল আমাদের জন্য সম্মানের। ১৯৯৬ সালে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সংবেদনশীল সাক্ষ্য-বিবরণ সংরক্ষণ ও পরিবেশনের পদ্ধতি এবং তরুণদের সম্পৃক্ত করতে জাদুঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও উৎসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। ১৪ ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের শিকার বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত গ্যালারিগুলোতে আমি আবার যাব; সেগুলো ছিল গভীরভাবে হৃদয়স্পর্শী। এমন আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ!

অনুবাদ : এম. ফারহাতুল হক
প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর
চলচ্চিত্র কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

৭১-এর স্মৃতিভাষ্য : শিল্পগুরু মুস্তাফা মনোয়ার

শেষ পর্ব

অনেক চিত্রশিল্পী ততোদিনে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে গেছেন। চিত্রশিল্পীদের জড়ো করে আমি নিতুন কুন্ডু, স্বপন চৌধুরীসহ আরও বেশ কয়েকজন আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল চিন্তামনি কর স্যারকে বললাম আমরা বাংলাদেশ থেকে এক্সিবিশন করতে চাই। তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। শিল্পীরা ছবি আঁকতে শুরু করলো। আমিও বেশ কয়েকটি ছবি আঁকলাম। প্রায় ১০-১৫ দিন এক্সিবিশন চললো। রূপান্তর শিল্পীগোষ্ঠী গঠিত হলো। কলকাতা এবং আশেপাশে বিভিন্ন পাড়ায় রূপান্তরের শিল্পীরা গান গাইতো। একদিন শরণার্থী শিবিরে গিয়ে দেখলাম সকলে একদম ম্রিয়মান। মুখে হাসি নেই, গম্ভীর! যেন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু তাদের জীবনে বাকি নেই। আমার খুব খারাপ লাগলো। বিশেষ করে ছোটদের দেখে। আমি ভাবলাম এরা তো খাদ্য পাচ্ছে। একটা স্থান পেয়েছে থাকার। কিন্তু মনের খাদ্য কোথায়? বড়রা না হয় সামলে নিবে, বাচ্চারা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে টেলিভিশনে যারা আমার সঙ্গে পাপেট করতো তারাও তিন-চারজন চলে এসেছে। তাঁদের নিয়ে পাপেট বানালাম। ওখানে আরেকজন খুব নামকরা শিল্পী ছিলেন তিনি আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। পাপেটের পোশাক বানাতে পার্ক সার্কাসের একটা ছোট্ট দর্জির দোকানে গেলাম। দোকানী ভীষণ বিরক্ত, বললো 'এত ছোট ছোট পোশাকের কি দাম দেবেন আপনারা?'। আমরা বললাম, ভীষণ দরকার, আপনি বানিয়ে দিন। আপনি যা মজুরি চাইবেন সেরকমই দিবো। তারপর দোকানী পাপেটের কিছু পোশাক বানিয়ে দিল। এর মধ্যে একদিন দর্জি দোকানী বললেন 'এগুলো কী করবেন আপনারা?' তখন আমি বললাম শরণার্থীরা এসেছে, তাদের বাচ্চারা তো একদম হাসছে না। এগুলো পাপেট হবে পুতুলের মতো। পাপেট তৈরি করে তাদের গল্প বলবো, তারা হাসবে, খেলবে, একটু মুক্ত হবে। একথা শুনে দর্জি দোকানী বললো 'তাই নাকি এরকম, তাহলে আমি এক পয়সাও নিবো না'। পুরোটা দিয়ে দিলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ আরেকজনের দুঃখে দুঃখিত হয়েছে। আমি আবার জোর করেই বললাম আপনি এত খেটেছেন দোকানী বললেন 'এটা শোনার পরে পয়সা নিলে আমার পাপ হবে আরও যদি প্রয়োজন হয় দেবেন, আমার কোনো অসুবিধা নেই'।

মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার শিল্পীরা লরিতে করে অনেক জায়গায় যেত। তার মধ্যে স্বপন চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান বেনু , তারিকসহ অনেকে ছিলো। সকলে মিলে গান গাইতে যেতো। এক সময় তারা বাংলাদেশের ভেতরেও ঢুকেছিলো। বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে তারা গান করেছে। কত ভয়ের মধ্যে তারা ছিলো। তবুও বাংলাদেশের মধ্যে যখন গেছে তখন সেইখানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আলিঙ্গন করেছে। এমনভাবে তাদের ডেকেছে, এত ভালোবেসেছে যে সেটা স্মৃতি হয়ে আছে। এদিকে আমরা রোজই প্রায় পাপেট বাচ্চাদের দেখাই। শিশুরা হাসে, খুব হাসে, অনুপ্রাণিতও হয়েছিলো। বাচ্চারা গেলেই ধরতো 'আবার কবে দেখাবেন, আবার কবে দেখাবেন।'

পাপেটের একটা গল্প ছিলো। এক কৃষককে রাজাকার ধরেছে। ধরে, ওকে জিজ্ঞেস করলো মুক্তি কিধার হ্যায়?। গুলি করবে এমন মুহূর্তে কৃষক বলে উঠলো দাঁড়াও দাঁড়াও আমি কইতাছি। তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষক বললো মুক্তি পাইছি স্যার, বুকের মাঝখানটা দেখিয়ে কৃষক বললো 'মুক্তি থাকে এইখানে'। প্রত্যেকের মনেই তখন মুক্তিযোদ্ধা বাস করতো। এরমধ্যে একজন আমেরিকান ক্যামেরাম্যান/ডকুমেন্টারি মেকার এলেন লিয়ার লেভিন। তিনি তো পাপেট দেখে ভীষণ খুশি। তখন উনি বললেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার, তুমি যে করছো। তোমরা হতাশ হয়ে যাওনি। সেই পাপেটগুলো লিয়ার লেভিন আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। বললেন ছবি তুলতে হবে আমার। পাপেটের তো খুব ক্লোজ আপ ছবি তুলতে হয়। সব পাপেটগুলো আমি দিয়ে দিলাম। উনি ছবি তুলে আবার আমাকে ফেরত পাঠালেন।

শওকত ওসমান সাহেব গেছেন আনন্দ বাজার পত্রিকায়। তিনি যুদ্ধের ওপর একটা উপন্যাসের মতো লিখবেন। সেটা আনন্দ বাজার সিরিজ গল্প ছাপাবে। আমারই ক্লাসফ্রেন্ড একজন বলেছে, মুস্তাফা মনোয়ার আছেন, ওকে দিয়ে ড্রইং করান। আমার ইলাসট্রেশনে শওকত ওসমানের সিরিজ গল্পটা প্রতি সপ্তাহে বেরুতো। বেশ কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পর শওকত ওসমান গেছেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। উনি ইলাসট্রেশনের ভীষণ প্রশংসা করেছেন। কে আঁকছে এরকম! এতো এখানকার নয়। এতো নিশ্চয়ই যুদ্ধের সবকিছু দেখেছে। না হলে তো এরকম আঁকতে পারতো না।

আমাদের সেট ডিজাইন দিল্লীতে ভীষণ প্রশংসিত হয়েছিলো। দিল্লীতে যখন গেলাম তখন ওরা বললো টেলিভিশনে তোমাদের এক ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম করতে হবে। আমি সেট করতে একঘণ্টা আগে টেলিভিশনে গেলাম। ওরা একটু হৈচৈ করলো। প্রডিউসার ছিলো ইমা তিনি বললেন 'আভি অ্যায়েগা, ইতনা দের করতা'। সেট যে বানাবে সে আমাকে ডাকলো। গিয়ে দেখি আমার ক্লাসফ্রেন্ড। সে প্রডিউসারকে বললো, 'ও সেট বানাবে'। প্রডিউসার বললো, 'ও কী সেট বানাবে? টেলিভিশনের ব্যাপার তো আলাদা।' আধ ঘণ্টার মধ্যে সব আঁকা হয়ে গেল। ওরা দেখে তো অবাক।

১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো ১৮ ডিসেম্বর আমাকে বাংলাদেশে চলে আসতে হলো। দূতাবাস থেকে বললো 'আপনাকে যেতে হবে, একটা প্লেন যাচ্ছে।' টেলিভিশন ওপেন করতে হবে। বাসায় ফোন করে বললাম 'আমাকে এখনই চলে যেতে বলছে' আমার স্ত্রী-কন্যারা সব রয়ে গেল। মিলিটারি প্লেনে আমরা এলাম। তারপরে তো টেলিভিশন আবার নতুনভাবে শুরু হলো।

৮ ডিসেম্বর ২০২০ ধারণকৃত সাক্ষাৎকার

বীর মুক্তিযোদ্ধা কানাই ঘোষের একাত্তরের দিনলিপি

২-পৃষ্ঠার পর

কানাই ঘোষ রাজশাহীতে চাকরি পান। এরপর দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি।

বহু বছর পর, ১৯৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতাকালীন কানাই ঘোষের এই ডায়েরিটি সাংবাদিক ও গবেষক রীতা ভৌমিকের হাতে তুলে দেন ত্রিবেদী। পরবর্তীতে রীতা ভৌমিক ডায়েরির নির্বাচিত অংশ ও কানাই ঘোষের গৃহীত সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে দৈনিক সংবাদ-এর উপসম্পাদকীয় পাতায় 'কানাই ঘোষের ডায়েরি থেকে' শিরোনামে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেন, যা সে সময় পাঠকমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

এরপর দীর্ঘ ২৮ বছরের অধিক সময় ধরে রীতা ভৌমিক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক দিনলিপিটি নিজের কাছে রাখেন। অবশেষে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণা, ইতিহাসচর্চা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষণের স্বার্থে তিনি ডায়েরিটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অমূল্য স্মারক হিসেবে দান করেন।

মন্টু বাবু সরকার
সহকারি আর্কাইভ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বিশেষ অতিথির মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কমিউনিটি লিয়াজোঁ অফিসের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বারজন কর্মকর্তার একটি দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। দলটির নেতৃত্ব দেন কমিউনিটি লিয়াজোঁ অফিসার Emily Greene। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর Joris Van Bommel ২৪ জুলাই ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন তার বোন Marieke Van Bommel, তিনি ডাচ্ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ওয়ার্ল্ড কালচারস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আউটরিচ কর্মসূচির আওতায় প্রতিদিন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী যুক্ত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই শিক্ষা কার্যক্রমে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্বউদ্যোগে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে নিয়ে আসেন এবং এটি তাদের পাঠক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতি সেমিস্টারে তাদের শিক্ষার্থীদের জাদুঘরে নিয়ে আসে, তবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমেই শেষ করেন না, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের আওতায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস কোর্সে এই শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন শেষে ফিরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়। গত ৩০ জুলাই ২০২৬ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের ডিন ড. সামিয়া হক এবং সহকারী ডিন তাহসীন এইচ আলী। তারা আউটরিচ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরবর্তী সেমিস্টার থেকে ব্র্যাকের এই শিক্ষা সফর আরো কার্যকর করা এবং ব্র্যাকের শিক্ষার্থীদের জাদুঘরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে যুক্ত করার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হকের সাথে আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরো নিবিড়ভাবে কাজ করবে বলে তারা প্রত্যাশা করেন।

আলেখ্যানুষ্ঠান 'তাঁদের সংগ্রামের বীরগাথা'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাহানারা ইমামের জীবন কথা ধারাবাহিকভাবে পাঠ করেন দুই পাঠিকা আবৃত্তিশিল্পী সানজিদা সোহেলী ও সুপ্রভা সেবতী । সুয়িয়া কামাল রচিত ভাগ্যবতী কবিতা আবৃত্তি করেন ইমরুন নাহার ইমু ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা 'বন্দি শিবির থেকে' আবৃত্তি করেন তাপস হাওলাদার। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন মহুয়া মঞ্জুরী সুনন্দা, পূরবী দে সিমন্তী, অর্নব বড়ুয়া ও মইনুর রহমান খান। নৃত্য পরিবেশন করেন সুদেষ্ণা স্বয়ংপ্রভা তাথৈ। আবহসঙ্গীতে ছিলেন, বাঁশীতে হৃদয় রায়, এস্রাজে-শৌনক দেবনাথ ও তবলায় সুবীর ঘোষ।

স্মৃতি আলেখ্যের মধ্য দিয়ে সুফিয়া কামাল ও জাহানারা ইমামের জন্ম, বেড়ে ওঠা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁদের ভূমিকার ধারাবাহিক উপস্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে আলোকচিত্র ও স্মারক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, দলিল ও স্মৃতিচিহ্ন দর্শণার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সুফিয়া কামাল ছিলেন কবি, সমাজসংস্কারক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে নারীশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে সরাসরি কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ত্রাণকাজে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা তাঁকে জাতীয় জীবনের এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। অন্যদিকে শিক্ষক, লেখক ও সমাজসচেতন নাগরিক জাহানারা ইমাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুত্র রুমীকে হারানোর ব্যক্তিগত শোককে রূপ দিয়েছিলেন জাতীয় প্রেরণায়। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেন। স্বাধীনতার পর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের দাবিতে তাঁর নেতৃত্ব ও সংগ্রাম বাংলাদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। এ কারণেই তিনি কেবল শহীদ রুমীর মা নন, সমগ্র জাতির 'শহীদ জননী' হিসেবে সম্মানিত। অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি এবং জীবনকথন পাঠের মাধ্যমে এই দুই মহীয়সী নারীর জীবন ও আদর্শকে শিল্পীতভাবে উপস্থাপন করা হয়। পরিবেশনাগুলো তাঁদের মানবিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সাহস এবং দেশপ্রেমকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁদের জীবন ও কর্ম বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই স্মরণালেখ্য সেই উত্তরাধিকার ধারণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

আলেখ্যানুষ্ঠানের শুরুতে ট্রাস্টি সারা যাকের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, আমরা তাদের জননী হিসেবে আখ্যায়িত করি। এই পরিচয়ের বাইরে তাদের বড় পরিচয় তাঁরা সাহসী নারী। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের পথে এবং পরবর্তীতে জন অধিকার সংরক্ষণে তারা সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাস পুরুষ কণ্ঠে রচিত হয় বলে এই মহিয়সী নারীদের দৃপ্ত পদচিহ্ন সেখানে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না।

এই আয়োজনে প্রযোজনা উপদেষ্টা ছিলেন সারা যাকের, প্রযোজনা নির্বাহী নাসেহুন আমীন, চিত্রনাট তৈরি করেন শরীফ রেজা মাহমুদ, নির্দেশনায় ছিলেন মাহফুজ রিজভী, কিউরেশন আমেনা খাতুন, আর্কইভাল কনটেন্ট মন্টু বাবু সরকার, মির্জা মাহমুদ, গ্রাফিকস : রেজাউল আহমেদ ও রাইয়ান আশরাফ, লাইট : অম্লান বিশ্বাস, প্রজেকশন: মাহফুজ তুহীন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অগণিত মানুষের বিপুল আত্মত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। দ্বিজাতি-তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালি জাতিসত্তা পদদলিত করে যে শোষণ-পীড়ন চাপিয়ে দিয়েছিল তার বিপরীতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে অভূতপূর্ব সংগ্রাম পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণ একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করে। তিনি ইতিহাসের মহানায়ক, নিপীড়িত জাতির মুক্তি-আন্দোলনের রূপকার।

স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ঘাতক-চক্র পরিবারের সদস্যবর্গসহ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর কীর্তি স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদন করে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ-এর ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড-এর আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০১৭ সালে। ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কো-কৃত মূল্যায়ন উদ্ধৃত হলো:

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

"The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" was delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 7th March, 1971 who led the people of Bangladesh to independence in 1971. At that time when the Pakistani military rulers refused to transfer power to the Bengali nationalist leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose party Awami League gained majority in the National Assembly of Pakistan in the general election held in 1970. The speech effectively declared the independence of Bangladesh. The speech constitutes a faithful documentation of how the failure of post-colonial nation-states to develop inclusive, democratic society alienates their population belonging to different ethnic, cultural, linguistic or religious groups. The speech was extempore and there was no written script. However, the speech survived in the audio as well as AV versions.

৫৫ বছর পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নিজের নাম খুঁজে পেলেন গমির উদ্দিন

বীর মুক্তিযোদ্ধা গমির উদ্দিন

পঞ্চগড় জেলার ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের একজন খেটেখাওয়া মানুষ গমির উদ্দিন, পিতার নাম ওমির উদ্দিন। ১৯৭১ সালে গমির উদ্দিন ছিলেন ২০ বছরের তরুণ, দিনমজুরী করে জীবন যাপন করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে চলে যান প্রশিক্ষণ নিতে। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে তাদের অপারেশনের আগে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে খবর আনার কাজ করতেন। যুদ্ধ শেষে নিজ গ্রামে নিজের জীবনযুদ্ধে ফিরে যান। স্বাধীন দেশে নিজের প্রাপ্য অংশের খবর রাখেননি। সাম্প্রতিক তিনি জানতে পারেন মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দেবার কথা, সাথে এও জানতে পারেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা আছে এবং জাদুঘর প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে যা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তিতে সহায়ক হয়। তিনি গত ১ জুন পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসেন বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ে। এই প্রান্তিক মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরে এসে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামাণ্য তালিকার ৬০ নম্বর খণ্ডে ৩৬৮৭০ নম্বর ক্রমিকে তাঁর নামটি খুঁজে পান। তাকে সনদপত্র এবং তালিকার নির্দিষ্ট ফর্মের ফটোকপি দেয়া হয়। তার চোখেমুখে দেখা যায় আশার আলো। মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে জনযুদ্ধ যেখানে গমির উদ্দিনের মতো সাধারণ জনগণ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র স্বেচ্ছায় স্বঃতস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই হয়তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। নিতান্ত অনাদর অবহেলায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রত্যাশা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাপ্য সম্মান পাবেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official